২। সূরা আনফালঃ ১ম রুকু(১-১০)আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡاَنۡفَالِ ؕ قُلِ الۡاَنۡفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوۡلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصۡلِحُوۡا ذَاتَ بَیۡنِکُمۡ ۪ وَ ৮ : ১
اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗۤ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ

১. লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আনফাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্বন্ধে; বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের; সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর আর আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তাফসীরের পূর্বে সে ঘটনাটি জানা থাকলে এর তাফসীর বুঝতে সহজ হবে।

বদরের ময়দানে কুরাইশ সেনাদলের কাছ থেকে যে, গনীমতের মাল লাভ করা হয়েছিল, তা বণ্টন করার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করার পর এই প্রথমবার তারা ইসলামের পতাকাতলে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই এ প্রসঙ্গে যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত বিষয়াদিতে ইসলামের বিধান কি তা তাদের জানা ছিল না। সূরা বাকারাহ ও সূরা মুহাম্মাদে কিছু প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনো কোন সামরিক কৃষ্টি, সভ্যতা ও রীতিনীতির ভিত্তি পত্তন করা হয়নি। আরো বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ন্যায় মুসলমানরা তখনো পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারণাই পোষণ করতো।

ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলিমদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩২২]

এক হাদীসে উবাদা ইবন সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা যখন শত্রুদের পরাজিত করেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে।

কিছু লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন।

কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করতে না পারে।

যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যারা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তারা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারো ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন, তারা বললেন, এতে

তোমরা আমাদের চাইতে বেশী অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতকল্পে তার পাশে সমবেত ছিলেন, তারা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-দের এসব কথাবার্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছার পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। এতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ তা'আলার; একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই; শুধু তাকে ছাড়া, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩২৪] অতঃপর সবাই আল্লাহ ও তার রাসূলের এই সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেন।

أَنْفَالٌ শব্দটি نَفْلٌ এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল সালাত, রোযা, সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই নফল বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ও ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশীতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় নফল ও আনফাল গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআনুল কারীমে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- (১) আনফাল (২) গনীমত এবং (৩) ফায়। أنفال শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غنيمة (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فيئ এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ) .. প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়।

أنفال বা গনীমত সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। [কুরতুবী; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

আর فيئ বা ফায় বলা হয় সে মালকে যা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক, অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আর نفل বা أنفال (নফল বা আনফাল) পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের অধিনায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে দিয়ে থাকেন। [কাশশাফ; আত তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও এ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। আবার কখনো 'নফল' ও 'আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ মুফাসসির এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ সূরা আনফাল নাযিল করার জন্য এ মনস্তাত্বিক পরিবেশ বেছে নিয়েছেন। এ বিষয় দিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত নিজের পর্যালোচনামূলক বক্তব্যের সূচনা করেছেন।

এ 'আনফাল' শব্দের মধ্যে মূল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়ে গেছে। আনফাল বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে "নাফল"। আরবী ভাষায় ওয়াজিব অথবা যথার্থ অধিকার ও মূল পাওনার অতিরিক্তকে নফল বলা হয়। এ ধরনের নফল যদি কোন অধীনের পক্ষ থেকে হয় তাহলে তার অর্থ হয়, গোলাম নিজের প্রভুর জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের চাইতে বাড়তি কিছু কাজ করেছে। আর যখন তা মালিক বা কর্তার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ হয়, এমন ধরনের দান বা পুরস্কার যা প্রভুর পক্ষ থেকে বান্দা বা গোলামকে তার যথার্থ পাওনা ও অধিকারের অতিরিক্ত বা বখশিস হিসেবে দেয়া হয়েছে। কাজেই এখানে এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও অনুগ্রহ সম্পর্কেই কি এ সমস্ত বাদানুবাদ, জিজ্ঞাসাবাদ ও কলহ-বিতর্ক চলেছে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমরা কবেই বা তার মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলে যে, তোমরা নিজেরাই তা বণ্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে? যিনি এ সম্পদ দান করেছেন তিনিই সিদ্ধান্ত দেবেন, কাকে দেয়া হবে, কাকে দেয়া হবে না এবং যাকে দেয়া হবে কতটুকু দেয়া হবে?

যুদ্ধ প্রসঙ্গে এটা ছিল একটা অনেক বড় ধরনের নৈতিক সংস্কার। মুসলমানদের যুদ্ধ দুনিয়ার বস্তুগত স্বার্থ ও সম্পদ লাভ করার জন্য নয় বরং সত্যের নীতি অনুযায়ী দুনিয়ার নৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিকৃতির সংস্কার সাধন করার জন্যই তা হয়ে থাকে। আর এ যুদ্ধনীতি বাধ্য হয়ে তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন প্রতিবন্ধক শক্তিগুলো স্বাভাবিক দাওয়াত ও প্রচার পদ্ধতির মাধ্যমে সংস্কার সাধনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়। কাজেই সংস্কারদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হবে উদ্দেশ্যের প্রতি। উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে যেসব সম্পদ লাভ করা হয়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শুরুতেই যদি এসব স্বার্থ থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে না দেয়া হয়, তাহলে অতি দ্রুত তাদের মধ্যে নৈতিক অধঃপতন সূচিত হবে এবং তারা এসব স্বার্থলাভকে নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করবে।

তাছাড়া এটা যুদ্ধ প্রসঙ্গে একটা বড় রকমের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংস্কারও ছিল। প্রাচীন যুগের পদ্ধতি ছিল, যুদ্ধে যে মালমাত্তা যার হস্তগত হতো সে-ই তার মালিক গণ্য হতো। অথবা বাদশাহ ও সেনাপতি সমস্ত গনীমতের মালের মালিক হয়ে বসতো। প্রথম অবস্থায় দেখা যেতো, প্রায়ই বিজয়ী সেনাদলের মধ্যে গনীমতের মাল নিয়ে প্রচণ্ড সংঘাত দেখা দিয়েছে। এমনকি অনেক সময় তাদের এ অভ্যন্তরীণ সংঘাত তাদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দিতো। দ্বিতীয় অবস্থায় সৈন্যরা চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তো। তারা গনীমতের মাল লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতো। কুরআন গনীমতের মালকে আল্লাহ ও রসূলের সম্পদ গণ্য করে প্রথমে এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, সমস্ত গনীমতের মাল কোন রকম কমবেশী না করে পুরোপুরি ইমামের সামনে এনে রেখে দিতে হবে। তার মধ্য থেকে একটি সুঁইও লুকিয়ে রাখা যাবে না। তারপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এ সম্পদ বন্টনের জন্য নিম্নোক্ত আইন প্রণয়ন করেছেঃ এ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর কাজ ও তাঁর গরীব বান্দাদের সাহায্যের জন্য বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। আর বাকি চার ভাগ যুদ্ধে যে সেনাদল শরীক হয়েছিল তাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিতে হবে। এভাবে জাহেলী যুগের পদ্ধতিতে যে দু' টি ত্রুটি ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বও জেনে রাখতে হবে। গনীমতেরমাল সম্পর্কে এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা

বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, “এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।” এ সম্পদ বন্টনের কোন প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা হয়নি। এর কারণ, প্রথমে স্বীকৃতি ও আনুগত্যের ভাবধারার পূর্ণতা লাভই ছিল উদ্দেশ্য। তারপর সামনের দিকে গিয়ে কয়েক রুকূ' পরে এ সম্পদ কিভাবে বণ্টন করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। তাই এখানে একে ‘আনফাল’ বলা হয়েছে এবং পঞ্চম রুকু'তে এ সম্পদ বণ্টন করার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে একে ‘গানায়েম’ (গনীমতের বহুবচন) বলা হয়েছে।

সূরা আল-আনফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিশতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য ‘ফায়’ -এর মালামাল- যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন।

“আর আল্লাহ ইয়াহুদীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ‘ফায়’ দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; বরং আল্লাহ যার উপর ইচ্ছে তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন; আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান”। সূরা হাশরঃ ৬

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ‘ফায়’ তাঁর রাসূলের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। তারপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু (وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, এতে ‘ফায়’ বিশেষভাবে রাসূলকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তবে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে তিনি নিজে সেটা নিয়ে নেননি। তোমাদের উপর নিজেকে প্রাধান্য দেননি। [বুখারী: ৩০৯৩]

সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। হাশরঃ ৭। এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীমতের মাল হলো সে সমস্ত মালামাল, যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে হস্তগত হয়। আর ফায় হলো সে সমস্ত মালামাল- যা কোন রকম জিহাদ এবং লড়াই ছাড়াই হাতে আসে। আর أنفال (আনফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জিহাদের নেতা বা পরিচালক দান করেন।

এ প্রসঙ্গে সাথীদেরকে পুরস্কার দেয়ার চারটি রীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে প্রচলিত ছিল।

(এক) এ কথা ঘোষণা করে দেয়া যে, যে লোক কোন বিরোধী শত্রুকে হত্যা করতে পারবে- যে সামগ্রী তার সাথে থাকবে সেগুলো তারই হয়ে যাবে, যে হত্যা করেছে। এসব সামগ্রী গনীমতের সাধারণ মালামালের সাথে জমা হবে না।

(দুই) বড় কোন সৈন্যদল থেকে কোন দলকে পৃথক করে কোন বিশেষ দিকে জিহাদ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া এবং এমন নির্দেশ দেয়া যে, এদিক থেকে যেসব গনীমতের মালামাল সংগৃহীত হবে সেগুলো উল্লেখিত বিশেষ

দলের সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তবে এতে শুধু এটুকু করতে হবে যে, সমস্ত মালামাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ সাধারন মুসলিমদের প্রয়োজনে বায়তুল মালে জমা করতে হবে।

(তিন) বায়তুল মালে গনীমতের যে এক-পঞ্চমাংশ জমা করা হয়, তা থেকে কোন বিশেষ গাযী (জয়ী)-কে তার কোন বিশেষ কৃতিত্বের প্রতিদান হিসেবে আমীরের কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী কিছু দান করা।

(চার) সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে কিছু অংশ পৃথক করে যারা মুজাহিদ বা সৈনিকদের ঘোড়া প্রভৃতি দেখাশোনা এবং তাদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে তাদেরকে বিনিময় হিসাবে দান করা। [ইবন কাসীর]

তাহলে আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু দাঁড়ালো এই যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, আপনার নিকট লোকেরা ‘আনফাল’ সম্পর্কে প্রশ্ন করে- আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আনফাল সবই হল আল্লাহ এবং তার রাসূলের। অর্থাৎ নিজস্বভাবে কেউ এসবের অধিকারী কিংবা মালিক নয়। আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোর ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই কার্যকর হবে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ ৮ : ২
يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ

২. মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তার আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে। আর তারা তাদের রব-এর উপরই নির্ভর করে

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ৮ : ৩

৩. যারা সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যা রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে;

أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۗ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ৮ : ৪

৪. তারাই প্রকৃত মুমিন তাদের রব- এর কাছে তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদাসমূহ, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই আয়াতসমূহে ঈমানদারদের ৬টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিনে পরিনত হবে এবং তাদের জন্যই রয়েছে উচ্চ মর্যাদা,ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

(১) তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে;

(২) আল্লাহর স্মরণের সময় আল্লাহর মহত্ত্বে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।

আয়াতে বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, “তাদের সামনে যখন আল্লাহর আলোচনা করা হয়, তখন তাদের অন্তর আঁতকে উঠে” । অর্থাৎ তাদের অন্তর আল্লাহর মহত্ত্ব ও ভালবাসায় ভরপুর, যার দাবী হলো ভয় ও ভীতি। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, “(হে নবী) সুসংবাদ দিয়ে দিন সে সমস্ত বিনয়ী, কোমলপ্রাণ লোকদিগকে, যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদে-

আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।” [সূরা হজ: ৩৫]

“আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহ, মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।” [সূরা আয-যুমার: ২৩]

আর অপর আয়াতটিতে আল্লাহর যিকর-এর এই বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে অন্তর প্রশান্ত হয়ে উঠে। বলা হয়েছে, “জেনে রাখ, আল্লাহর যিকর-এর দ্বারাই আত্মা শান্তি লাভ করে, প্রশান্ত হয়।” [সূরা আর-রাদ: ২৮]

(৩) কুরআন পাঠ করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (যার দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান কম-বেশি হয়; যেমন মুহাদ্দিসগণের অভিমত।)

এ আয়াত এবং এ ধরণের অসংখ্য আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করে যে, ঈমান যেহেতু মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস ও সে অনুযায়ী দ্বীনী নির্দেশের উপর আমল করা এ তিনটি বস্তুর নাম, সেহেতু এগুলোর হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, আনুগত্যের দ্বারা ঈমান বর্ধিত হয় আর অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। মহান আল্লাহর বাণীঃ (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ) “আর যারা হেদায়াত অবলম্বন করে তিনি তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন, তাদেরকে তাকওয়া প্রদান করেন” । [সূরা মুহাম্মাদঃ ১৭]

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ) “তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বর্ধিত হয়।” [সূরা আল-ফাতহঃ ৪] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। [বুখারীঃ ৭৫১০, মুসলিমঃ ১৯৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈমানের সত্তরের উপর শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ হলোঃ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন হক্ক মা’ বুদ নেই, সর্বনিম হলোঃ পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। [সহীহ মুসলিমঃ ৫৭]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা, আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের কারণে ঈমান বাড়ে। আর তাদের অবাধ্যতার কারণে ঈমান কমে যায়। এমনকি কারো কারো ঈমানের পর্যায় সরিষা পরিমাণে পৌছে যায়। যেমনটি হাদীসে এসেছে। আর একথা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও প্রমাণিত যে, সৎকাজের দ্বারা ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি লাভ হয় এবং এমন আত্মিক প্রশান্তি সৃষ্টি হয়, যাতে সৎকর্ম মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন তা পরিহার করতে গেলে খুবই কষ্ট হয় এবং পাপের প্রতি একটা প্রকৃতিগত ঘৃণার উদ্ভব হয়, যার ফলে সে তার কাছেও যেতে পারে না। ঈমানের এ অবস্থাকেই এক হাদীসে ঈমানের মাধুর্য শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেঃ ১। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসা; ৩। কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করা। (২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; মুসলিম ১/১৫ হাঃ ৪৩, আহমাদ ১২০০২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৫)

সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হলো, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হবে, তখনই তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে, তাতে উন্নতি সাধিত হবে এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে

(৪) তারা নিজ প্রভু (আল্লাহর) উপর ভরসা করে।

ভরসা করার অর্থঃ যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায় অবলম্বন পরিহার করে না, কারণ তা অবলম্বন করার আদেশ মহান আল্লাহই দিয়েছেন। তবে বাহ্যিক উপায়কেই তারা সব কিছু মনে করে না; বরং তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, আসলে সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন কোনই কাজে আসবে না। আর এই দৃঢ়-বিশ্বাস ও ভরসার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হতে এক পলও গাফেল থাকে না। পরবর্তীতে আরো কিছু গুণের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। এই সকল গুণের অধিকারীদেরকে মহান আল্লাহ প্রকৃত মু'মিন গণ্য করেছেন এবং ক্ষমা, দয়া ও উত্তম জীবনোপকরণের সুসংবাদ দিয়েছেন। (আল্লাহ আমাদেরকে যেন তাদের দলভুক্ত করেন।)

৫। মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো সালাত প্রতিষ্ঠা করা। আয়াতে সালাতের জন্য ইকামত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুত: ইকামত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা করে দাঁড় করানো। কাজেই সালাত কায়েম করার মর্মার্থ হচ্ছে, যেমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়েছেন, সেভাবে ফরয ও নাফল যাবতীয় সালাত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সার্বিক দিক থেকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, যেমন সালাতে কলব হাযির থাকা; কেননা এটাই সালাতের মূল বিষয়। [সা' দী] কাতাদা বলেন, ইকামাতুস সালাত অর্থ, সুনির্দিষ্ট সময়ে, ওজুসহ, রূকু-সাজদাসহ আদায় করা। [ইবন কাসীর]

৬। মুমিনের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তাকে যে রিযক দান করেছেন, তা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করবে। আল্লাহর পথে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরীআত নির্ধারিত যাকাত, নফল দান-খয়রাত, আত্মীয়দেরকে প্রদান, বড়দের কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি দান-সদকাই অন্তর্ভুক্ত। [সা' দী]

বড় বড় ও উন্নত পর্যায়ের ঈমানদাররাও ভুল করতে পারে এবং তাদের ভুল হয়েছেও। যতদিন মানুষ মানুষ হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে আছে, ততদিন তার আমলনামা শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট মানের কার্যকলাপে ভর্তি থাকবে এবং দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে এমনটি হতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহর একটি বড় রহমত হচ্ছে এই যে, যতদিন মানুষ বন্দেগীর অনিবার্য শর্তসমূহ পূর্ণ করে, ততদিন আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করতে থাকেন এবং তার কার্যাবলী যে ধরনের প্রতিদান লাভের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, নিজ অনুগ্রহে তার

চেয়ে কিছু বেশী প্রতিদান তাকে দান করেন। নয়তো যদি প্রত্যেকটি ভুলের শাস্তি ও প্রত্যেকটি ভাল কাজের পুরস্কার আলাদাভাবে দেবার নিয়ম করা হতো, তাহলে কোন অতি বড় সৎলোকও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতো না।

বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, (أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) অর্থাৎ এমন সবলোকই হলো সত্যিকার মুমিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট অবর্তমান, তারা মুখে কালেমা পড়লেও বললেও তাদের অন্তরে থাকে না তাওহীদের রং, আর থাকে না রাসূলের আনুগত্য। কোন এক ব্যক্তি হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে- হে আবু সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বললেনঃ ভাই, ঈমান দুই প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ, তার ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর এবং জান্নাত-জাহান্নাম, কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আল-আনফালের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপূর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে, তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। [বাগভী; কুরতুবী]

(২) এখানে মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ মর্যাদা, (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিযক।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সূরা থেকে-----

- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ- (سورت الحجرات ১৫)-

‘প্রকৃত মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। বস্ততঃপক্ষে তারাই হ’ল সত্যনিষ্ঠ’ (হুজুরাত ৪৯/১৫)।

অত্র আয়াতে প্রকৃত মুমিনের দু’টি গুণ বর্ণিত হয়েছে। ১. সন্দেহমুক্ত দৃঢ় ঈমান এবং ২. আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপন।

- মুমিনের ৭টি গুণ বর্ণনা করে অন্যত্র আল্লাহ বলেন,
  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ- إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ- فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ- الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ-
  ‘সফলকাম হ’ল ঐসব মুমিন’
  (১) ‘যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী’
  (২) ‘যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে’

(৩) ‘যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে’
(৪) ‘যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে’
(৫) ‘নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না’
(৬) ‘অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হ’ল সীমা লংঘনকারী’
(৭) ‘আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে’
(৮) ‘যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফাযত করে’
‘তারাই হ’ল উত্তরাধিকারী ‘যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ (মুমিনূন ২৩/১-১১)।

যে গুণটি অর্জন করলে আল্লাহর রহমত অবশ্যই নাযিল হয়, সেটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

‘(মুনাফিকদের বিপরীতে) মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়’ (তাওবাহ ৯/৭১)।

অত্র আয়াতে মুমিন পুরুষ ও নারীর প্রধানতম গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হ’ল ‘সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ’। মূলতঃ এ কারণেই মুসলিম উম্মাহর উদ্ভব হয়েছে এবং এটা যথাযথভাবে প্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব

- হাদীসের আলোকে------------

মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না। (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন’। বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮

অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ ‘আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’। মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪।

তিনি বলেন, (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’ । তিরমিযী হা/১৯২০; আবু দাউদ হা/৪৯৪৩।

- আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النّاسُ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السّوءَ.

মুমিন সেই, যার থেকে মানুষ (সবদিক থেকে) নিশ্চিন্ত থাকে, মুসলিম সেই যার জিহ্বা এবং হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির হল ঐ ব্যক্তি, যে অন্যায় বর্জন করে চলে। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৬৫৬১

- আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

- أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

  ঈমানের দিক থেকে মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ঐ ব্যক্তি, যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮২; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৬২

- আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন,
  আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, এমন মুমিন, যে নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, এমন মুমিন, যে নির্জনে কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় বাস করে, সে আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৮৮

- আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

- إِنّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبّكَ أَصَابِعَهُ.
  মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ, একে অপরকে শক্তি যোগায়। একথা বলে তিনি তাঁর দুই হাতের আঙুল প্রবিষ্ট করে দেখালেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৮৫

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَيۡتِكَ بِالۡحَقِّ ◌ۙ وَ اِنَّ فَرِيۡقًا مِّنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لَكٰرِهُوۡنَ ৫ : ৮

৫. এটা এরূপ, যেমন আপনার রব আপনাকে ন্যায়ভাবে আপনার ঘর থেকে বের করেছিলেন অথচ মুমিনদের এক দল তো তা অপছন্দ করছিল।

আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এই ‘ঘর’ বলতে মদীনা তাইয়্যেবার ঘর কিংবা মদীনা মুনওয়ারাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থান করছিলেন। [মুয়াসসার] কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে بِالۡحَقِّ শব্দ ব্যবহার

করে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, এই সমুদয় বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যে সত্যের মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই [ফাতহুল কাদীর]

(২) অর্থাৎ মুসলিমদের কোন একটি দল এ জিহাদ কঠিন মনে করেছিল এবং পছন্দ করছিল না। কারণ, সাহাবায়ে কিরাম এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌছে যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্ৰী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবন আব্বাস, ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখের বর্ণনা মতে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবন নওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানতো যে, এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল কুরাইশদের সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীসাথীদেরকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন।

তখন ছিল রমাদান মাস। যুদ্ধেরও কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তারা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হলো, যাদের নিকট এই মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদেও যেতে চায়, শুধু তারাই যাবে। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই।

কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। বস্তুতঃ যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি তাদের এই অনিচ্ছার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অংশ গ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয়, যার মোকাবেলা করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীদেরকে খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বি’ রে সুক্ইয়া’ নামক স্থানে পৌছে যখন একজন সাহাবীকে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিনশ তের জন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেনঃ তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে সর্বমোট উটের সংখ্যা ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ার হয়েছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তারা ছিলেন আবু লুবাবাহ ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তারা বলতেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলবো। এ কথার প্রেক্ষিতে রাহমাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসতোঃ না তোমরা আমার চাইতে বেশী বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদেরকে দিয়ে দেব।

সুতরাং নিজের পালা এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পায়ে হেঁটে চলতেন। অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান আইনে-যোরকায় পৌছে এক ব্যক্তি কুরাইশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করছেন; তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দমদম্ ইবন উমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু'হাজার টাকা মজুর দিয়ে এ ব্যাপারে রাযি করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মুকাররামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌছে দেবে যে, তাদের কাফেলা মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীসাথীদের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দম্দম্ ইবন উমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশংকা ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক ও কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোষাকের সামনে পিছনে ছিড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালের ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকলো, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ চৈ পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারগ ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলিমদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরণের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে

অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলিম ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনো হিজরত করতে না পেরে তখনো মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে এবং বনু-হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি সন্দেহ হতো যে, এরা মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

এভাবে সব মিলিয়ে এ বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দুশ' ঘোড়া, ছ’ শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওয়ানা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবারের জন্য দশটি করে উট জবাই করা হতো। অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমাদান শনিবার মদীনা মুনওয়ারা থেকে রওয়ানা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌছে দু’ জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে সাগরের তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলিমদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। [ইবন কাসীর]

বলাবাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন সিদ্দীকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজকে নিবেদন করলেন। তারপর ফারুকে আযম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে নিবেদন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী-ইসরাঈলরা দিয়েছিল মূসা আলাইহিস সালাম-কে। তারা বলেছিলঃ (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) অর্থাৎ কাজেই তুমি আর তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব। সে সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার ‘বার্কুলগিমাদ’ স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোআ করেন। কিন্তু তখনো আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসারগণের যে

সহযোগীতার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেনঃ বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, আমরা এই জিহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কি না? এ সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ।

সা'দ ইবন মো' আয আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি কি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেনঃ 'হ্যাঁ' । তখন সা'দ ইবন মুআয রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন, তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করবো। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।

এ বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু' টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দুটি দল বলতে- একটি হলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। [বাগভী]

ؕ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُوْنَ ৬ : ৮

৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বিতর্ক করে। মনে হচ্ছিল তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা যেন তা অবলোকন করছে।

তারা সে সময় বিপদের মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছিল, অথচ বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়াই তখন ছিল সত্যের দাবী। ঠিক তেমনি গনীমতের মাল হাতছাড়া করতে আজ তাদের কষ্ট হচ্ছে, অথচ তা পরিহার করে হুকুমের প্রতীক্ষা করাই আজ সত্যের দাবী। এর দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে, যদি আল্লাহর আনুগত্য করো এবং নিজের নফসের খাহেশের পরিবর্তে রসূলের কথা মেনে নাও, তাহলে ঠিক তেমনি ভাল ফল দেখতে পারে, যেমন এখনি বদর যুদ্ধের সময় দেখেছো। কুরাইশদের সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া তোমাদের কাছে বড়ই দুঃসহনীয় মনে

হয়েছিল এবং তাকে তোমরা ধ্বংসের বার্তাবহ মনে করেছিলে। কিন্তু যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করলে তখন এ বিপজ্জনক কাজটিই তোমাদের জন্য জীবনের সাফল্যের বার্তা বহন করে আনলো।

সাধারণভাবে সীরাত ও যুদ্ধের বর্ণনা সংক্রান্ত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে যেসব বর্ণনা এসেছে, কুরআনের এ বক্তব্য পরোক্ষভাবে তার প্রতিবাদ করেছে। অর্থাৎ এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে নবী ﷺ মু’ মিনদের নিয়ে প্রথমে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তারপর কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করার পর যখন জানা গেলো মক্কা থেকে কুরাইশদের সেনাবাহিনী কাফেলার হেফাজত করার জন্য এগিয়ে আসছে তখন পরামর্শ করা হলো, কাফেলার ওপর আক্রমণ করা হবে না সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা হবে? কিন্তু কুরআন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে। কুরআন বলছে, নবী ﷺ যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, তখনই কুরাইশ সেনাদলের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ করার বিষয়টি তাঁর সামনে ছিল। আর কাফেলা ও সেনাদল কোনটিকে আক্রমণ করা হবে, এ পরামর্শও তখনি করা হয়েছিল। সেনাদলের মোকাবিলা করা অপরিহার্য, এ সত্যটি মু’ মিনদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেলেও তাদের মধ্য থেকে একদল লোক যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বিতর্ক করে চলছিল। তারপর সবশেষে যখন সেনাদলের দিকে অগ্রসর হবার বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়ে গেলো তখন, এ দলটি মদীনা থেকে একথা মনে করেই বের হলো যে, তাদেরকে সোজা মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

وَ اِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَ تَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ ৮ : ৭
لَكُمْ وَ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ يَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ

৭. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; অথচ তোমরা চাচ্ছিলে যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদেরকে নির্মূল করেন।

দুদল বলতে বানিজ্য কাফেলা কিংবা কুরাইশ সৈন্য। [মুয়াসসার]

নিরস্ত্র দল বলতে বানিজ্য কাফেলা, যার সাথে কেবলমাত্র ত্রিশ-চল্লিশ জন রক্ষী ছিল। [বাগভী]

আল্লাহ চাইছিলেন বাতিলকে(কুরাইশ) সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। আর মুমিনদেরকে এমন বিজয় দেখাবেন যার কল্পনাও তাদের অন্তরে আসেনি। [সা’দী]

হয়তো বা বাণিজ্য কাফেলার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে আর বিনা যুদ্ধে তোমরা প্রচুর ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে। অন্যথা কুরাইশ সেনাদের সাথে তোমাদের সংঘর্ষ হবে এবং তোমাদেরই জয় হবে ও গনীমতের মাল লাভ করবে।

আল্লাহ এর বিপরীত চাচ্ছিলেন যে, তোমাদের মুকাবিলা কুরাইশ সেনাদের সাথে হোক, যাতে কুফরের শক্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাক; যদিও এটি মুশরিকদের নিকট ছিল অপছন্দনীয়।

ۚ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ৮ : ৮

৮. এটা এ জন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য ও বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করে না।

এ থেকে অনুমান করা যায়, সে সময় কোন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ সূরার ভূমিকায় বলা হয়েছে কুরাইশ সেনাদল অগ্রসর হবার পর মূলত প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, ইসলামী দাওয়াত ও জাহেলী ব্যবস্থা এ দুয়ের মধ্যে আরব ভূখণ্ডে কার বেঁচে থাকার অধিকার আছে? যদি মুসলমানরা সে সময় সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে এগিয়ে না আসতো, তাহলে এরপর ইসলামের জন্য আর বেঁচে থাকার কোন সুযোগ থাকতো না। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের ঘর থেকে বের হয়ে পড়ার এবং প্রথম পদক্ষেপেই কুরাইশ শক্তির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে ইসলাম মজবুতভাবে পা রাখার জায়গা পেয়ে গিয়েছিল এবং এর পরের সমস্ত মোকাবিলায় জাহেলিয়াত একের পর এক পরাজয়বরণ করেছিল।

আল্লাহ বলেন, কাফেররা চায় আল্লাহর নূরকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে। অথচ আল্লাহ চান তার নূরকে পূর্ণ করতে। আর আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না’ (ছফ ৮)।

আল্লাহ বলেন, তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি উক্ত দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে’ (ছফ ৬১/৯)।

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ৯ : ৮

৯. স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রব-এর নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।

এই যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। পক্ষান্তরে কাফেরদের সংখ্যা ছিল এর তিনগুণ (এক হাজারের মত)। মুসলিমরা ছিল খালি হাতে অন্য দিকে কাফেরদের নিকট ছিল পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র। এই অবস্থায় মুসলিমদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন মহান আল্লাহ। তারা কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন।২য় হিজরীর ১৭ই রামাযান শুক্রবার সকালে যুদ্ধ শুরু হয় (ইবনু হিশাম ১/৬২৬)।

নবী (সাঃ) নিজে অন্য এক তাঁবুতে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দু’ আ করছিলেন। (বুখারীঃ যুদ্ধ অধ্যায়)

রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নিকটে আকুলভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা করেন,

اللَّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِىْ مَا وَعَدْتَنِىْ اللَّٰهُمَّ إِنِّيْ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ... اللَّٰهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا-

‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা জানাচ্ছি। ... হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ’ লে আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত করার মত কেউ যমীনে আর থাকবে

না’ । তিনি প্রার্থনায় এমন আত্মভোলা ও বিনয়ী হয়ে ভেঙ্গে পড়লেন যে, তার স্কন্ধ হ’তে চাদর পড়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে আবুবকর ছুটে এসে চাদর উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ ‘যথেষ্ট হয়েছে হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পালনকর্তার নিকটে আপনি চূড়ান্ত প্রার্থনা করেছেন’ ।বুখারী হা/৪৮৭৫, মিশকাত হা/৫৮৭২।

সুতরাং মহান আল্লাহ দু’আ কবূল করলেন এবং এক হাজার ফিরিশতা একের পর এক মুসলিমদের সাহায্যে পৃথিবীতে নেমে এলেন। (এটি হল প্রথম পুরস্কার।)

এ সময় আয়াত নাযিল হ’ল - إِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ‘যখন তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকটে কাতর প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের দো‘আ কবুল করলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে, যারা ধারাবাহিকভাবে অবতরণ করবে’ (আনফাল ৮/৯)।[1] ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা যোগদান করেননি (ইবনু কাছীর)। উল্লেখ্য যে, সূরা আনফাল ৯ আয়াতে ‘এক হাযার’, আলে ইমরান ১২৪ ও ১২৫ আয়াতে যথাক্রমে ‘তিন হাযার’ ও ‘পাঁচ হাযার’ ফেরেশতা অবতরণের কথা বলা হয়েছে’ । এর ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ‘এক হাযার’ সংখ্যাটি তিন হাযার বা তার অধিক সংখ্যাকে নিষেধ করে না। কেননা উক্ত আয়াতের শেষে مُرْدِفِيْنَ শব্দ এসেছে। যার অর্থ ‘ধারাবাহিকভাবে আগত’ । অতএব আল্লাহর হুকুমে যত হাযার প্রয়োজন, তত হাযার ফেরেশতা নাযিল হবে’ ।[2] বস্ততঃ সংখ্যায় বেশী বলার উদ্দেশ্য মুসলিম বাহিনীকে অধিক উৎসাহিত করা এবং বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় এক সময় সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি জেগে উঠে বললেন, أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ، هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَقُودُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ ‘সুসংবাদ গ্রহণ কর হে আবুবকর! তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই যে জিব্রীল, তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ধূলি উড়িয়ে এগিয়ে আসছেন’ । আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ২২৫ পৃঃ, সনদ হাসান; ইবনু হিশাম ১/৬২৬-২৭, সনদ ‘মুরসাল’ (তাহকীক ইবনু হিশাম ক্রমিক ৭৪৭)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ ‘ঐ যে জিব্রীল যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন’। অতঃপর তিনি তাঁবুর বাইরে এসে বললেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ (‘সত্বর দলটি পরাজিত হবে এবং

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে’-ক্বামার (৫৪/৪৫)। ইবনু হিশাম ১/৬২৭; বুখারী হা/৩৯৫৩, ৩৯৯৫; মিশকাত হা/৫৮৭২-৭৩ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায়, মু ‘জেযা অনুচ্ছেদ-৭ ; সীরাহ ছহীহাহ ২/৩৬৫ পৃঃ।
অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বাইরে এসে আঙ্গুলের ইশারা করে করে বলেন, هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ ‘এটি অমুকের বধ্যভূমি’। এটি অমুকের, ওটি অমুকের’। রাবী আনাস (রাঃ) বলেন, তাদের কেউ ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারেনি, যেখানে যেখানে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ইশারা করেছিলেন। মুসলিম হা/১৭৭৯ (৮৩); মিশকাত হা/৫৮৭১।

ؕ وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ مَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ১০ : ৮
اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ
১০. আর আল্লাহ এটা করেছেন শুধু সুসংবাদ স্বরূপ এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই আসে; নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়

ফিরিশতাদের অবতরণ কেবলমাত্র সুসংবাদ ও তোমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ছিল। তাছাড়া সত্যিকারে সাহায্য ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে। যিনি ফিরিশতা বিনাও তোমাদের সাহায্য করতে পারতেন। তবে এটা ভাবাও ঠিক নয় যে, ফিরিশতারা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ফিরিশতারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং কিছু কাফেরদেরকে হত্যাও করেছিলেন। (দেখুনঃ বুখারী, মুসলিম যুদ্ধ অধ্যায়)